Dengue - সিঁদুরে মেঘ

ডেঙ্গি বাড়ছে শহরে। কলকাতা পুরসভার পরিসংখ্যানেই স্পষ্ট, ২০২১ সালের জানুয়ারির গোড়া থেকে জুলাইয়ের শেষ অবধি শহরে ডেঙ্গি আক্রান্তের সংখ্যা যত ছিল, এই বছর ওই একই সময়ে আক্রান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় তিন গুণ। সম্প্রতি এই রোগে এক কিশোরের মৃত্যুও ঘটেছে। মনে রাখা প্রয়োজন, ডেঙ্গি মরসুম শেষ হতে এখনও ঢের বাকি। যদিও জলবায়ু পরিবর্তনের অবধারিত ফল হিসাবে ডেঙ্গি-ম্যালেরিয়া এখন সম্বৎসরের সঙ্গী, তবুও ডেঙ্গির চরম পর্যায় হিসাবে জুলাই-অগস্ট থেকে অক্টোবর-নভেম্বর মাস পর্যন্ত সময়কালকে ধরা হয়। সেই হিসাব অনুযায়ী আশঙ্কা, এখনও পর্যন্ত ডেঙ্গির যে প্রকোপ দেখা গিয়েছে, তা হিমশৈলের চূড়ামাত্র। অ-কাজ ও ঢিলেঢালা মনোভাব অব্যাহত থাকলে আগামী তিন মাসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

অবশ্য, ডেঙ্গি নিয়ে প্রশাসনিক নির্দেশ-সতর্কবার্তার অভাব নেই। অভাব নেই থানাগুলিকে বাড়তি সতর্ক থাকতে বলায়, পুরসভার ঘন ঘন বৈঠকে, কর্মসূচি রূপায়ণের ক্ষেত্রেও। অভাব শুধুমাত্র, সেই কর্মসূচি রূপায়ণের ক্ষেত্রে সুষ্ঠু পরিকল্পনা নির্মাণ, মাঠে নেমে কাজের গতি এবং সদিচ্ছার ক্ষেত্রে। কোনও ওয়ার্ডে আক্রান্তের সংখ্যা বাড়লে সেখানে পুর-তৎপরতা বৃদ্ধি লক্ষ করা যায়, অন্যত্র সাধারণত ব্লিচিং পাউডার ছড়িয়েই দায়িত্ব পালন হয়। বিধাননগরে ডেঙ্গি দমনে পুরসভার পক্ষ থেকে জঙ্গল সাফ করা, ফাঁকা জমির মালিককে নোটিস ধরানো, খাটালের মালিকদের সতর্ক করা-সহ একাধিক পদক্ষেপের কথা জানানো সত্ত্বেও, প্রতিশ্রুতির বছর ঘোরার আগেই আবর্জনার স্তূপ, ঝোপজঙ্গলের পরিচিত ছবি ফের ফিরে এসেছে। একই রকম উদাসীনতার চিত্র শহরের থানাগুলিতেও। থানাগুলিকে পরিচ্ছন্ন রাখার প্রশাসনিক নির্দেশ সত্ত্বেও থানার সামনে পড়ে থাকা পরিত্যক্ত গাড়ি, বাতিল টায়ারে জল জমে মশার আঁতুড়ঘর তৈরি হয়, ফুলের টবে জল দাঁড়িয়ে থাকে, আবর্জনার স্তূপও জমে। নির্দেশ পালন করানোর দায়িত্ব যাঁদের হাতে, তাঁরাই যদি এত অ-সচেতন হন, তবে সাধারণের মধ্যে সচেতনতা জন্মাবে কী করে?

অবশ্য ডেঙ্গি নিয়ে এ-হেন গয়ংগচ্ছ মনোভাব নতুন নয়। পতঙ্গবাহিত রোগ ঠেকাতে বছরে তিন-চারটি মাসের উদ্যোগ যে যথেষ্ট নয়, এ কথা বহু বার বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীও বিভিন্ন সময়ে ডেঙ্গি নিয়ে সতর্ক করেছেন। কিন্তু ডেঙ্গি দমনের প্রচারে যত ঢাকঢোল বাজে, প্রকৃত কাজ হয় সামান্যই। মশার লার্ভা খুঁজে ধ্বংসের কাজে ড্রোনের মতো অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার সত্ত্বেও কেন সংক্রমণে রাশ টানা যাচ্ছে না, তা বুঝতে পুর-প্রশাসনের আত্মসমীক্ষার প্রয়োজন। এবং প্রয়োজন উপযুক্ত পরীক্ষাগারের সংখ্যাবৃদ্ধি ও পতঙ্গবিদ নিয়োগের। একই সঙ্গে, সরকারকে একটি প্রশিক্ষিত বাহিনী গড়ে তুলতে হবে, যাঁরা সারা বছর প্রতি বাড়ি ঘুরে জমা জল ও মশার আঁতুড়ঘরগুলি ধ্বংসের কাজটি করবেন। জনস্বাস্থ্যের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকদেরও বিভিন্ন পুরসভা, রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর, জনস্বাস্থ্য কারিগরি-সহ বিভিন্ন দফতরের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে কাজ করতে হবে। কথাগুলি নতুন নয়, বহু আলোচিত। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাওয়ার আগেই অবিলম্বে সেই পুরনো পাঠ ঝালিয়ে নেওয়া প্রয়োজন।

https://wbcsbengalicompulsorypaper.com/

Hoardings -অবগুণ্ঠিত

কলকাতা বহু দিনই ‘কুৎসিত’ হয়েছে। সৌজন্যে, যত্রতত্র হোর্ডিং টাঙানোর কু-অভ্যাস। অথচ, কলকাতা পুরসভা প্রায় এক দশক আগে শহরটিকে ‘সুন্দর’ বানানোর সঙ্কল্প করেছিল। সেই উদ্দেশ্যে শুরু হয় অভিযানও। সে সময় এসপ্ল্যানেড-ডালহৌসি চত্বর থেকে বহু হোর্ডিং সরিয়ে দিয়েছিল তারা। প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল নতুন কোনও হোর্ডিং না বসানোরও। শেষ পর্যন্ত প্রতিশ্রুতি পালন হয়নি। সে অঞ্চলে বেশ কিছু দৃষ্টিনন্দন ইমারত রয়েছে, যার অনেকগুলিই ঐতিহ্যবাহী। কিন্তু সে সব মুখ লুকিয়েছে হোর্ডিঙের জঙ্গলের আড়ালে। পুরসভা এত দিনেও হোর্ডিং সরানোর কাজটি করে উঠতে পারেনি কেন?

কলকাতার ঐতিহ্য বড় কম নয়। শহরের আনাচেকানাচেই ছড়িয়ে রয়েছে নানাবিধ ঐতিহাসিক নিদর্শন। এই ঐতিহ্য রক্ষার দায়িত্বও প্রশাসনের। কিন্তু ‘হোর্ডিঙে ঢাকা’ শহরের মুখ সেই দায়িত্ব পালনে খামতির ছবিই তুলে ধরছে। বিশ্বের অন্য কোনও ঐতিহ্যমণ্ডিত শহরে নান্দনিক বোধের এমন প্রকট অভাব চোখে পড়ে কি? শুধু এসপ্ল্যানেড-ডালহৌসি চত্বরই নয়, গোটা শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোড়, অফিসপাড়া, আবাসিক এলাকা, সরকারি দফতর— সর্বত্র একই ছবি। রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন কর্মসূচি থেকে শুরু করে সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন কিংবা বাণিজ্যিক সংস্থা, বিভিন্ন প্রকল্পের বিজ্ঞাপনে ছয়লাপ দৃষ্টিপথ। এমনকি বিজ্ঞাপনের হোর্ডিঙের আওতার বাইরে নেই বাতিস্তম্ভ, ফুটব্রিজ বা রাস্তার আইল্যান্ডও। ভোট কিংবা পুজোর সময়ে শহর ছেয়ে যায় নানা আকারের হোর্ডিঙে। এবং বহু ক্ষেত্রেই সে সব লাগানো হয় কলকাতা পুরসভার অনুমতি ছাড়াই। উদ্দেশ্যপূরণের পরেও সেগুলি বহু দিন নিজ স্থানে থেকে যায়। পুরসভার তরফে সেগুলি সরানোর উদ্যোগও বিশেষ চোখে পড়ে না। এই সব হোর্ডিং শহরের রাজপথে দৃশ্যদূষণ তো ঘটায়ই, পাশাপাশি এর থেকে জনসাধারণের বিপদের আশঙ্কাও থেকে যায়। বিশেষ করে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় পুরনো হোর্ডিং ভেঙে পড়লে প্রাণহানি ঘটাও আশ্চর্য নয়। প্রসঙ্গত, একটি হোর্ডিং পড়ে চেন্নাইয়ে এক মহিলা স্কুটার আরোহীর মৃত্যু বা পুণেতে বেআইনি হোর্ডিং সরাতে গিয়ে একাধিক ব্যক্তির প্রাণহানির নজির রয়েছে। কিন্তু চেন্নাই বা পুণের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নেয়নি কলকাতা পুরসভা।

এটা ঠিক যে, বিজ্ঞাপন থেকে রাজস্ব আয় হয় কলকাতা পুরসভার। কিন্তু দুর্নীতি-সহ প্রশাসনিক গাফিলতির মতো নানাবিধ কারণে অধিকাংশ হোর্ডিং থেকেই প্রত্যাশিত রাজস্ব আদায় হয় না। যার ফলে, গত কয়েক বছর ধরে ধুঁকছে কলকাতা পুরসভার রাজকোষ। তাই বিজ্ঞাপন থেকে আগামী দিনে যথাযথ আয়ের জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ করতে হবে পুরসভাকে। একই সঙ্গে হোর্ডিং লাগানোর বিষয়েও সতর্ক নজর দিতে হবে তাদের, যাতে শহরের প্রস্তাবিত সৌন্দর্যায়নের প্রচেষ্টা জলে না যায়। পুরসভার পক্ষ থেকেও জানানো হয়েছে, হেরিটেজ বিল্ডিংগুলি থেকে হোর্ডিং সরানোর কাজটি অবিলম্বে সারতে চায় তারা। প্রশাসনের ইঙ্গিত পেলেই শুরু হবে কাজ। যদিও সেই ইঙ্গিত পেতে সময় লাগতে পারে আরও তিন মাস। অর্থাৎ, ফের বিলম্ব। আশঙ্কা, হোর্ডিং আড়াল সরিয়ে তিলোত্তমার নিজ রূপটি প্রকাশ করার আশু সম্ভাবনা নেই।

https://wbcsbengalicompulsorypaper.com/

Air pollution -শেষ সুযোগ

একেবারে প্রথম স্থানটি অধিকার করতে পারেনি কলকাতা। তা দিল্লির দখলে। দ্বিতীয় হয়েছে কলকাতা। ভারতের শহরগুলির মধ্যে নয়, বৈশ্বিক সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, সবচেয়ে দূষিত বায়ু এই দুই শহরেই। যে সমীক্ষাটি হয়েছে, তাতে পিএম ২.৫ দূষণের চরম মাপ নয়, ব্যবহার করা হয়েছে পপুলেশন-ওয়েটেড অ্যাভারেজ— অর্থাৎ, শহরের জনসংখ্যা বেশি, তাই দূষণের পরিমাণও বেশি, এমন যুক্তি ব্যবহার করা চলবে না। বায়ুদূষণের অন্যতম প্রধান কারণ অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড— কলকারখানা, যানবাহন ইত্যাদিতে ব্যবহৃত জীবাশ্ম জ্বালানি। এখানে কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে, রাজধানী শহর দিল্লির অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে ধুঁকতে থাকা কলকাতার কোনও তুলনাই চলে না, তবুও এই শহরের দূষণের মাত্রা দিল্লির সঙ্গে তুলনীয় হয়ে ওঠে কী ভাবে? এই প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তর, শহরের পরিবেশরক্ষার প্রশ্নে কলকাতার অভিভাবকদের সদিচ্ছার এবং উদ্যোগের পরিমাণ আরও কম। বায়ুদূষণ যে-হেতু চোখে দেখা যায় না, ফলে তার ক্ষতির পরিমাণটি বোঝা কঠিন। স্মরণ করিয়ে দেওয়া যাক, শ্বাসতন্ত্রের জটিলতা থেকে ক্যানসার, হৃদ্‌রোগ, বহু প্রাণঘাতী অসুস্থতার জন্য বায়ুদূষণ প্রত্যক্ষ ভাবে দায়ী। এবং, বায়ুদূষণজনিত কারণে প্রতি বছর গোটা দুনিয়ায় চার কোটি মানুষ প্রাণ হারান— তাঁদের প্রতি চার জনে এক জন ভারতীয়। অসুস্থ হন তারও বহু গুণ বেশি মানুষ। এই অসুস্থতার আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ বিপুল; কিন্তু তার চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল, এই বিপদের সামনে নাগরিক সম্পূর্ণ অসহায়। বায়ুদূষণ থেকে বাঁচার উপায় মানুষের নেই। ফলে, এই বিপদটিকে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া রাজ্যের অপরিহার্য কর্তব্য।

অন্যান্য বিপদের মতো বায়ুদূষণের ক্ষেত্রেও দরিদ্র মানুষের উপর বিপদের বোঝাটি বিসদৃশ রকম ভারী। দূষণের নিরিখে প্রথম ২০টি শহরের মধ্যে সিঙ্গাপুর বাদে উন্নত দেশের আর কোনও শহর নেই। চিনের বেজিং এবং শাংহাই তালিকায় আছে, কিন্তু সে দেশ দ্রুত উন্নয়নশীল। নিউ ইয়র্ক, লন্ডন, প্যারিস বা টোকিয়োর তুলনায় ঢাকা, নাইজেরিয়ার লাগোস, ডেমোক্র্যাটিক রিপাবলিক অব কঙ্গো-র কিনশাসা বা ইন্দোনেশিয়ার জাকার্তায় দূষণের মাত্রা বেশি কেন, এই প্রশ্নটিকে উড়িয়ে দেওয়ার কোনও উপায় নেই। উন্নয়নশীল দেশের নগরায়ণের প্রক্রিয়াটিকে খতিয়ে দেখা জরুরি। শহরের মধ্যে রাস্তার অনুপাতে যানবাহনের সংখ্যা, যানজটের বহর, গণপরিবহণের যথেষ্ট ব্যবস্থা না থাকা; আবার শিল্পক্ষেত্রে শিথিলতর দূষণবিধি, দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেওয়া— প্রতিটি জিনিসই দূষণের মাত্রাকে বাড়িয়ে তুলতে পারে। এবং, শহরের অভ্যন্তরেও দায়বণ্টনের বৈষম্য অনিবার্য— যাঁরা ব্যক্তিগত গাড়িতে সফর করেন, তাঁদের দূষণের দায় সমান ভাবে বইতে হয় দরিদ্রতম মানুষকেও।

পরিবেশের প্রশ্নটিকে অস্বীকার করে, তার থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকার সময় অনেক আগেই পেরিয়ে গিয়েছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী আন্তর্জাতিক মঞ্চে দূষণ নিয়ন্ত্রণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বটে, কিন্তু তাকে কাজে পরিণত করার চেষ্টা এখনও দৃশ্যমান নয়। বিশেষত নগরাঞ্চলের দূষণ প্রতিরোধে একটি সুনির্দিষ্ট ও সুসংহত নীতি প্রয়োজন। তাতে নতুন নির্মাণের জন্য নির্দিষ্ট নিয়মবিধি যেমন থাকবে, তেমনই প্রয়োজন গণপরিবহণ নীতিরও। জোর দিতে হবে পরিবেশবান্ধব, পুনর্নবীকরণযোগ্য জ্বালানি ব্যবহারের উপর। শহরের সেন্ট্রাল বিজ়নেস ডিস্ট্রিক্টে ব্যক্তিগত গাড়ি ব্যবহারের উপর কড়াকড়ি করা প্রয়োজন। সাইকেলের জন্য পৃথক করিডরের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। অন্য দিকে, শহরে বৃক্ষরোপণ করতে হবে। কলকাতা শহর গত কয়েক বছরে সম্পূর্ণ বিপরীতগামী হয়েছে। এই প্রবণতায় লাগাম পরানো প্রয়োজন। বাঁচার শেষ সুযোগটিও যাতে হাতছাড়া না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে।

https://wbcsbengalicompulsorypaper.com/

পঁচাত্তরের পরিব্রজন

আজ থেকে পঁচাত্তর বছর আগে এই দিনটির প্রত্যূষে ভারত নামে দেশটির সামনে ছিল বহু স্বপ্ন। যে দেশ পরাধীনতার আগেও কখনও একটিমাত্র স্বশাসিত রাষ্ট্র ছিল না, ছিল ছড়ানোছিটানো নানা অঞ্চলের সমষ্টিমাত্র, তাকে একটি সংহত জাতিরাষ্ট্রের চেহারা দেওয়ার স্বপ্ন। যে দেশের সমাজ দারিদ্র, শোষণ অনধিকার আর যুগসঞ্চিত বঞ্চনায় স্মরণাতীত কাল যাবৎ নিমজ্জিত, সেই যন্ত্রণাপঙ্ক থেকে তাকে তুলে আনার স্বপ্ন। অর্থনীতিকে সুস্থ, সুষ্ঠু ও সবল করে নাগরিকদের সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার স্বপ্ন। নবলব্ধ গণতন্ত্র হিসাবে জগৎসভায় এক মর্যাদাময় আসন লাভের স্বপ্ন। আজ পঁচাত্তর বছর পর পিছনে ঘুরে তাকালে বলতেই হয়— ইতিমধ্যে বেশ কিছু স্বপ্নপথ পরিক্রমা করতে সমর্থ হয়েছে এই দেশ, আংশিক ভাবে হলেও। যাত্রাপথে ছিল তীক্ষ্ণ কাঁটাবন, অতল চোরাখাদ। তবু এক শতকের তিন-চতুর্থাংশ পথ হেঁটে এসে গণতন্ত্র হিসাবে ভারত বিশ্বময় যে পরিচয় ও সম্মান অর্জন করেছে, তা খুব সামান্য কথা নয়। সুনীল খিলনানি প্রমুখ রাষ্ট্রতাত্ত্বিকদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সাধারণ নাগরিকও স্বীকার করবেন যে ১৯৪৭ সাল-পরবর্তী ভারতের ইতিহাস আসলে এক অসামান্য পরিব্রজন-কাহিনি, যার কেন্দ্রবিন্দু— গণতন্ত্র। যদি কোনও দিন গণতন্ত্রের ইতিহাস লেখা হয়, তা হলে আমেরিকার স্বাধীনতা, ফরাসি বিপ্লব ইত্যাদির পর খুব দূরে পিছিয়ে থাকবে না এই বিশালাকার জনবহুল দেশটির গণতন্ত্র-গাথা।

এই গৌরবগাথার মধ্যে কোনও মুহূর্তকে আলাদা করে মনে করতে হলে অবশ্যই দুটি সময়ের কথা বলতে হবে। এক, ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি, যখন স্বাধীন শিশুদেশটি নিজেকে দৃপ্ত গৌরবে প্রজাতন্ত্র বলে ঘোষণা করল, এবং একটি অসামান্য সংবিধানের কাছে বিশ্বস্ত থাকার অঙ্গীকার করল। দূরদূরান্তে ছড়িয়ে থাকা অগণিত দরিদ্র-দুঃখী মানুষ কি জানতেও পেরেছিলেন সে দিন যে, তাঁদের জন্য কী আশ্চর্য একটি রক্ষাকবচ আবির্ভূত হল এই ভারতভূমিতে— যার নাম নাগরিকের সাংবিধানিক অধিকার? দ্বিতীয় মুহূর্তটি এর সঙ্গেই সংযুক্ত: ১৯৫২ সালের প্রথম সাধারণ নির্বাচন। আসমুদ্রহিমাচল এই বিপুল দেশের পর্বতনদীঅরণ্য ভেদ করে প্রতি শহর গ্রাম জনপদে বিপুলসংখ্যক মানুষকে যে ভোট দিতে শেখানো যায়, রাষ্ট্রগঠনের কাজে তাদের পরোক্ষে হলেও যুক্ত করা যায়, দুশো বছর রাজত্বের পরও কি ব্রিটিশ কর্তারা কল্পনা করতে পেরেছিলেন? ইতিহাসবিদরা বলেন, আর একটি অত্যুজ্জ্বল কৃতিত্বের দাবিদার ভারত নামে এই স্বাধীন গণতান্ত্রিক দেশটি: বৃহৎ মাপের ‘আইডিয়া’ বা চেতনাধারা নিয়ে পরীক্ষানিরীক্ষা করার সাহস ও দক্ষতা দেখানোর কৃতিত্ব। বহু অভাব ও অসম্পূর্ণতা থেকে গেলেও পৃথিবীর অন্য প্রাক্তন-উপনিবেশ দেশগুলির থেকে এখানেই ভারত অনেক এগিয়ে গিয়েছে, হয়তো এগিয়ে রয়েছেও।

‘হয়তো’ শব্দটি জুড়তে হত না যদি না গত কিছু কাল যাবৎ সেই সহস্র উজ্জ্বল সূর্য-খচিত গণতন্ত্রদিগন্তে রাহুগ্রাস নেমে আসত। রাজনৈতিক পরীক্ষানিরীক্ষার মধ্যেই আজ ভারতের শাসনকেন্দ্র টলতে শুরু করেছে পিছন দিকে। গণতন্ত্রের মূল দুটি স্তম্ভ, বাকস্বাধীনতা ও সহনশীলতা তলাতে শুরু করেছে নীচের দিকে। আগেও এ দেশ গণতন্ত্রের সঙ্কট দেখেছে, জরুরি অবস্থা দেখেছে। কিন্তু তার থেকে রাজনীতি ও সমাজ শিক্ষাও নিয়েছে, সঙ্কটমুক্তির অভিমুখের দিকে এগিয়েছে। এ বার কিন্তু অন্য রকম। সংখ্যাগুরু ও সুবিধাভোগীর স্পর্ধিত আস্ফালনে সংখ্যালঘু ও প্রান্তিক মানুষ প্রত্যহ বেশি করে অসহায় হয়ে পড়েছেন, দরিদ্র সম্বলহীন হচ্ছেন। এ যেন আত্মবিস্মরণের কাল, আত্মহননের প্রয়াস। গণতান্ত্রিক আবহকে যদি এই বেলা রক্ষা করা না যায়, ভারত কিন্তু তার পরিচয়টিই হারাবে, যে পরিচয়-পতাকা সে দুর্জয় দুঃসাহসে উড়িয়ে দিয়েছিল ১৯৪৭ সালের ১৫ অগস্ট।

https://wbcsbengalicompulsorypaper.com/